মূলপাতা

সকল ধর্ম সত্য, পর্ব-২

Jubaer Hossain

April 28, 2016
18 MIN READ

[৪]

নিরীশ্বরবাদী দুয়েকটি ধর্ম (যেমন বৌদ্ধধর্ম) বাদে মোটামুটি সবধর্মই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে। কেউ হয়তো একেশ্বরবাদী, আবার কেউ হয়তো বহুঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কিন্তু স্রষ্টাকে এরা সবাই মানে। অথচ ইসলাম মুসলিম বাদে সবাইকে 'কাফির' বলছে। কেন?

অনেকে "কাফির" শব্দটাকে একটা গালি বা অনুরূপ কিছু ভেবে থাকেন। অথচ সূরা কাফিরূনে আল্লাহ্ নিজেই "বলুন, হে কাফিরগণ" বলে সম্বোধন করতে বলেছেন। "কাফির" শব্দের মানে প্রত্যাখ্যানকারী। অর্থাৎ যারা তাওহীদের বাণীটাকে প্রত্যাখ্যান করে, তারাই হল কাফির। এখন তাহলে সম্পূরক প্রশ্ন এসে যায়, তাওহীদকে গ্রহণ আর প্রত্যাখ্যান বলতে কী বোঝায়?

আদম 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূল মানুষকে একটি দাওয়াতই দিয়ে গেছেন, তা হল এই তাওহীদের দাওয়াত। তাওহীদকে যারা গ্রহণ করেছে, তারাই সফল হয়েছে, আর যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাওহীদ মানে আল্লাহ্র একত্ববাদ।

আল্লাহ্র একত্ববাদ মানে কী? আল্লাহ্ দুইজন নয় বরং একজন, এটাই কি আল্লাহ্র একত্ববাদ?

আমাদের অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়ে গেছে যে, একজন আল্লাহ্কে বিশ্বাস করার নামই তাওহীদ। অথচ তা ই যদি হত, তাহলে একেশ্বরবাদী সমস্ত ধর্মের মানুষই তাওহীদের সাক্ষ্য দিত। খৃস্টানরা একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, করে ইহুদীরা, করে একেশ্বরবাদী হিন্দুরা। এমনকি মক্কার কাফিররা, আবু জাহেল, আবু লাহাবরা পর্যন্ত আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত। আল্লাহ্ বলেনঃ

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" [আনকাবুতঃ ৬৩]

তারমানে মক্কার কাফিররাও বিশ্বাস করত বৃষ্টি দেওয়া, জীবন দেওয়ার মালিক কেবল আল্লাহ্, কোন দেবদেবী বা অন্য কেউ নয়। তারাও আল্লাহ্কে 'একজন'ই মানত। তবু তারা কাফের।

এর কারণ বুঝতে গেলে আমাদের তাওহীদের বাক্যটা বুঝতে হবে। তা এই যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

এ বাক্যটিও শুরু হয়েছে Negativity দিয়ে। একটি ভরা পাত্রে নতুন কিছু ভরতে হলে আগে পাত্রটা খালি করতে হয়। তেমনিভাবে তাওহীদের বাণীটা মাথায় নিতে হলে অন্যসব আদর্শ, ফিলোসফি বর্জন করতে হয়। প্রথম অংশ "লা ইলাহা" অর্থাৎ "কোন ইলাহ নেই" দিয়ে আল্লাহ্ প্রথমে সকল ইলাহকে বাতিল ঘোষণা করলেন। এরপর বললেন "ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ্ ব্যতীত"। আগে বর্জন, তারপর গ্রহণ। আগে সমস্ত ইলাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ঘোষণা, এরপর বলা "কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত" অর্থাৎ ইলাহ হবার যোগ্য কেবল এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্।

ইলাহ মানে কী? ইলাহ হলেন সেই সত্ত্বা, যিনি আনুগত্যের, উপাসনার একমাত্র যোগ্য। আমার সমস্ত অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভরশীল, যাকে আমি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক এবং একমাত্র ক্ষমতাশালী আর ইবাদাতের যোগ্য বিশ্বাস করি, তিনি আমার ইলাহ।

আল্লাহ্‌কে একমাত্র ইলাহ মেনে নেওয়া মানে জন্ম থেকে মৃত্য পর্যন্ত কেবল আল্লাহ্র আনুগত্য, তাঁর হুকুম অনুসারে জীবন সাজানো। ধরুন আপনি যে অফিসে কাজ করেন তার বস আপনাকে নামাজের জন্য সময় দেয়না। এখন আল্লাহ্র আদেশ হল ওয়াক্তমত নামাজ পড়া, আর বসের আদেশ হল সে টাইমে অফিসের কাজ করা। আপনি যদি বসের কথা মানেন তবে আপনি সে মুহূর্তে 'ইলাহ' তথা আনুগত্যের যোগ্য মানলেন, অথচ মানার কথা ছিল আল্লাহ্‌কে, বসকে অসন্তুষ্ট করে হলেও। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মানতে পারেন নি, যেহেতু আপনার কাছে বসের আনুগত্য আল্লাহ্র আনুগত্যের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে।

ঠিক তেমনিভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহ্র হুকুম বাদ দিয়ে যখন মানুষের তৈরি আইন, নীতি দিয়ে বিচার করা হয়, তখন সেটা সুস্পষ্টভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর লঙ্ঘন। আপনি যদি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে জনগণকে ক্ষমতার মালিক মানেন, সেখানে আপনাকে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে জনগণকে 'ইলাহ' মানলেন।

তেমনি কিছু লোক ভোটের দাবিদার হয়ে আইনসভায় গিয়ে আইন বানাচ্ছে, সেখানে তারা নিজেদের 'ইলাহ' এর আসনে বসাচ্ছে। কারণ তারা নিজেদের পছন্দমত আইন তৈরি করছে, যেগুলো সরাসরি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক, অথচ আইনগুলো আল্লাহ্র দেওয়া, যেগুলো বাতিলের ক্ষমতা কারো নেই। কাজেই কেউ যদি তা বাতিল করে তারমানে সে আল্লাহ্র চেয়ে নিজেকে ক্ষমতাধর দাবি করছে, আর নিজেকে ইলাহর আসনে বসিয়েছে।

সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

"তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মা'বূদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।"

আয়াতটি লক্ষ করুন। আল্লাহ্ এখানে বলছেন ইহুদি-খৃস্টানদের কথা, যে তারা নিজেদের পাদ্রী-পুরোহিতকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছিল। যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অংশটি তিলাওয়াত করছিলেন তখন হযরত আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু'আনহু বলেছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তারা তো পুরোহিতদের সামনে রুকুসেজদা করে না, তাহলে তারা কীভাবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল? "

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

"কেননা তাদের এসব পুরোহিতরা যখন কোন কিছুকে হালাল (বৈধ) সার্টিফিকেট দিত তখন সমাজের মানুষ সেটাকে হালাল মনে করতো, হারাম (অবৈধ) সার্টিফিকেট দিলে হারাম। তারা আল্লাহর কালাম অনুযায়ী যাচাই করতো না।"

সুতরাং আমরা দেখছি আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন পুরোহিত-যাজকদের কথা অনুসারে যারা বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করত, তারা মুশরিক, তারা আল্লাহ্র আসনে এই পুরোহিতদের বসিয়েছে। আমরা কি বর্তমান সভ্যদেশে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখিনা? সুদকে আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন, দেশের আইন কি সেটাকে বৈধতা দেয়নি? পতিতালয়কে বৈধতা দেয়নি? জেনা-ব্যাভিচারকে দেয়নি? এখন আপনি যদি আল্লাহদ্রোহী এই আইনের আওতায় যেয়ে সুদ, পতিতালয়কে অবৈধ না ভাবেন, তারমানে আপনি দেশের আইনপ্রণেতাদের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছেন, যেমনটা সেকালের লোকেরা তাদের যাজক-পুরোহিতদের বানিয়েছিল।

মক্কার কুফফাররাও আল্লাহকেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক বলে মানত, যেটা একটু আগেই বলেছি। তবু তারা কাফের। কারণ তারা বিধানদাতা, হুকুমের মালিক হিসেবে আল্লাহ্‌কে মানেনি। একইভাবে ফির'আউনও আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করত, কিন্তু সে ক্ষমতা, আইন আর সার্বভৌমত্বের মালিক হিসেবে নিজেকে দাবি করত, আল্লাহ্‌কে নয়। তাই সে কাফির।

এজন্য আল্লাহ্ একাধিক নয় বরং ‘একজন’, এটা একেশ্বরবাদের সাক্ষ্য হতে পারে, কিন্তু তাওহীদের সাক্ষ্য নয়। আল্লাহ্‌কে জীবন-মৃত্যু, রিজিক, ক্ষমতা, হুকুম, সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক ও কর্তৃত্বের দাবিদার হিসেবে মেনে না নিলে কখনোই তাওহীদের ওপর পূর্ণ ঈমান থাকবেনা। তাওহীদের বাণী কেবল মসজিদের জন্য নয়, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত কেবল আল্লাহ্র আনুগত্য চলবে, বেডরুম থেকে হোয়াইট হাউজ পর্যন্ত কালিমার বাণী প্রতিষ্ঠিত হবে। আইনসভা, বিচারসভা, বঙ্গভবন সমস্ত জায়গায় কেবল আল্লাহ্র হুকুম আর বিধানের আনুগত্য চলবে, আর কারো নয়। এটাই তাওহীদের মূল কথা।

সুতরাং কেবল মুখে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ নয়, বরং কথায় ও কাজে তার প্রমাণের মাধ্যমে একজন প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব। মুখে কেবল আল্লাহ্‌কে মালিক বলব, আর আনুগত্য করব তাগুত সরকারের, মানবরচিত আইনের, তাহলে শিরক থেকে বেরোনো যাবেনা। যেমনটা আল্লাহ্ বলেছেনঃ

"অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।" [সূরা ইউসুফঃ ১০৬]

এ আলোচনায় আমরা স্পষ্ট দেখলাম, এমনকি একজন মানুষ নিজেকে মুসলিম দাবি করেও তাওহীদের বিপরীতে থাকতে পারে। তাহলে যারা ইসলামকেই গ্রহণ করেনি, তাদের পক্ষে কীভাবে তাওহীদে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব? এ কারণেই ইসলাম তাদের ‘প্রত্যাখ্যানকারী’ বা ‘কাফির’ সম্বোধন করেছে।

পৃথিবীতে “সনাতন ধর্ম” নামে একটি ধর্ম প্রচলিত। সনাতন শব্দের মানে আদি ও প্রাচীন। অথচ প্রকৃত সনাতন ধর্মের নাম ‘ইসলাম।’ কারণ ইসলামের মূল কথা হল তাওহীদ, আর তাওহীদের বাণী জগতের প্রথম মানুষটি থেকেই প্রচারিত হয়ে আসছে।

অতএব ইসলাম নতুন আবির্ভূত হওয়া কোন ধর্ম নয়। এটি হাজার বছর ধরে চলে আসা একটি মূলনীতি, যা মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সাফল্যের শর্ত। আদম (আ) থেকে শুরু করে এই তাওহীদই প্রচারিত হয়েছে, যা কেবল একটিই পথ, যাকে আমরা “সীরাতুল মুস্তাক্বীম” নামে অবিহিত করি। “সীরাত” শব্দের অর্থ পথ, আল্লাহ্ সূরা ফাতিহায় “সাবিল” বা পথ শব্দের অন্য প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে “সীরাত” ব্যবহার করেছেন, কারণ “সীরাত” শব্দের বহুবচন হয়না, আর সরল পথ কেবল ও কেবলমাত্র একটিই। আর সেটা হল তাওহীদ; সাফল্য ও মুক্তির একমাত্র পথ।

[৫]

আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হল তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য। দুটো সাক্ষ্যকে একত্রিত করে যে বাক্যটা, তা কালিমা শাহাদাত নামে আমাদের সবার কাছেই পরিচিতঃ

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

এ বাক্যের দুটো অংশ। প্রথম অংশে আল্লাহ্র একত্ববাদ তথা তাওহীদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আর দ্বিতীয় অংশে রাসূল (সা) এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। প্রথম অংশটি নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এবারে রিসালাতের সাক্ষ্য নিয়ে কিছু কথা বলি।

তাওহীদের পাশাপাশি অবস্থান হওয়াই বলে দিচ্ছে রিসালাতের সাক্ষ্য কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে স্বীকার না করলে মুসলিম হওয়া যাবে না। প্রশ্নটি হল রিসালাতের সাক্ষ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

এজন্য যে, তাওহীদের সাক্ষ্যটি দেওয়ার সাথে সাথে অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে। কেননা আপনি আল্লাহ্‌কে একমাত্র ইলাহ মেনে নিলে আপনার সমস্ত কাজ হতে হবে আল্লাহ্র পছন্দ অনুসারে। আর এই কাজগুলো কীভাবে করতে হবে তা প্র্যাক্টিক্যালি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন রোল মডেল দরকার। তাছাড়া মানুষকে তাওহীদের বাণীটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য একজন শিক্ষকের

প্রয়োজন। নবী-রাসূলরা সেই শিক্ষক ও রোল মডেলের দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং রিসালাতকে মেনে নেবার অর্থ তাঁরা আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ, এটা স্বীকার করে নেওয়া, কাজেই তাঁদের প্রচারিত তাওহীদের বাণীই সত্য তাওহীদ, এখানে আমার নিজের মনগড়া তত্ত্ব চলবেনা, এই স্বীকারোক্তি দেওয়া।

তাওহীদের বাণী সর্বযুগে অপরিবর্তিত ছিল, কিন্তু শরীয়াহ যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান আর অনুধাবনের সামর্থ্য অনুসারে পালটেছে। তাই বিভিন্ন রাসূলের শরীয়াহর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর এই শরীয়াহ তথা দ্বীনের পূর্ণতা ঘটেছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে, তাই এই শরীয়াহ কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া মানে এটাকে স্বীকার করে নেওয়া।

আমাদের রাসূল হচ্ছে মুহাম্মাদ (সা), তাঁর ওপর প্রবর্তিত শরীয়াহই আমাদের জন্যই প্রযোজ্য। আমরা কালিমা শাহাদাতে যখন রাসূল (সা) কে রাসূল বলে স্বীকার করছি, সাথে সাথে তাঁর দ্বীন তথা শরীয়াহর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অর্থাৎ রাসূল (সা) যা বলেছেন সেটাই আমাদের ধর্ম, সেটাই আমাদের জীবনবিধান, অন্য কোন কিতাব যেমন বাইবেল, বেদ বা ত্রিপিটকে মানবধর্মের কোন বাণী থাকলেও আমরা তা গ্রহণ করব না, কারণ আমরা রাসূল (সা) কেই আমাদের শরীয়াহর মডেল হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছি।

তাই পূর্ববর্তী কোন নবীর বিধান আমাদের জন্য ফলো করার অবকাশ নেই। রাসূল (সা) বলেছেন তাঁর সময়ে মুসা (আ) বেঁচে থাকলে তিনিও রাসূল (সা) কেই ফলো করতেন। আমরা জানি ঈসা (আ) যখন পৃথিবীতে আবার আগমন করবেন তখন তাঁর কালিমা হবে আমাদেরই কালিমা, অর্থাৎ রাসূল (সা) এর রিসালাতের সাক্ষ্য। তাই তখন তিনি নিজের শরীয়াহ নয় বরং রাসূল (সা) এর একজন উম্মাত হিসেবে রাসূল (সা) এর শরীয়াহ ফলো করবেন। কাজেই এটা পরিষ্কার যে রাসূল (সা) ব্যতীত অন্য নবী-রাসূলের শরীয়াহ আমাদের জন্য ফলো করার কোন সুযোগ নেই।

তাহলে বলুন, যেখানে রাসূল (সা) ব্যতীত কোন নবী-রাসূলের শরীয়াহ পর্যন্ত ফলো করার অনুমতি নেই, সেখানে কীভাবে কৃষ্ণ, লালন-বাউল ফকির কিংবা কার্ল মার্কস-আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রবর্তিত বিধান ফলো করা একজন মুসলিমের জন্য জায়েয হতে পারে?

রিসালাতের সাক্ষ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, কোন কাজ তখনই ইবাদাত হবে যখন সেটা রাসূল (সা) এর শেখানো পথে হবে। যেহেতু আমরা তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল মেনে নিচ্ছি, কাজেই তাঁর পথটাই আল্লাহ্র পছন্দনীয় পথ, সেটাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র উপায়। নিজের ইচ্ছামত কাজ করে সেটাকে ইবাদাত ভাবার কোন সুযোগ নেই।

তাছাড়া কুরআনকে সত্য বলে স্বীকার করতে হলে যার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে তাঁকেও সত্য রাসূল বলে মেনে নিতে হবে। রিসালাতের সাক্ষ্য তাই একইসাথে কুরআনের সত্যায়নকারী এবং কুরআন-সুন্নাহ তথা রাসূল (সা) এর শরীয়াহকে একমাত্র জীবনব্যস্থা হিসেবে স্বীকার করার নামান্তর।

[৬]

অনেকে বলে থাকেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ‘ভালো মুসলিম’ হতে হবে? ‘ভালো মানুষ’ হওয়াটাই কি যথেষ্ঠ নয়?

এই প্রশ্নের জবাবে আমি নোটের প্রথম পর্বে কথা বলেছিলাম। কেন ‘ভালো মানুষ’ হওয়া যথেষ্ঠ না, ঈমান ব্যতীত ভালো কাজ কেন আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, ‘ভালো কাজ’ আর ‘ইবাদাত’ এর কী পার্থক্য, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কাজেই এখানে পুনরায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ ব্যাপারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ এখানে সংযোজন করছি। আশা করি আমরা এখান থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন এটা আমরা সবাই স্বীকার করি। রিসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্তির আগে যে চল্লিশটি বছর তিনি কাটিয়েছেন তাতে তিনি চারিত্রিক মাধুর্যের এত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে মক্কার বিকৃত রুচির কুফফাররাও তাঁকে প্রাণভরে ভালোবাসত আর বিশ্বাস করত, উপাধি দিয়েছিল “আল-আমীন।”

অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামিন সূরা দ্বুহার ৭ নং আয়াতে বলেছেন,

“তিনি (আল্লাহ্) আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেন।”

একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ্ তাকে “পথহারা” বলেছেন। আরবের সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের মানুষ হয়েও তাঁকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ পথহারা বললেন। কেন?

এজন্য যে, তিনি যতক্ষণ কুরআন প্রাপ্ত না হলেন, ততক্ষণ সত্যিকারের সীরাতুল মুস্তাক্বীমের সন্ধান পান নি। যদিও মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম,

কিন্তু আল্লাহ্ তো “ভালো মানুষ” চান নি, চেয়েছেন “ভালো দাস।” তাই কুরআনের জ্ঞান পাওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত “পথহারা” বলে বিবেচিত আল্লাহ্র কাছে। যেহেতু তিনি তাঁর রবকে চিনতে পারেন নি যতক্ষণ কুরআনপ্রাপ্ত না হলেন।

সুতরাং আপনি যতই ভালো মানুষ হোন, যতই একেশ্বরবাদী হোন, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবেন না যতক্ষণ আপনার কাছে কুরআনের জ্ঞান না থাকবে। আল্লাহ্র কাছে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের জন্য দরকার ইলমে দ্বীন, তাওহীদে ঈমান। আর সেকারণেই কুরআনের জ্ঞান ব্যতীত কোন ‘ভালো মানুষ’ আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় নয়।

[৭]

অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী?

আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি ইসলাম অন্যান্য ধর্মকে অনুমোদন দেয়নি। তাদেরকে ‘বাতিল’ বলে আখ্যায়িত করেছে। এ ব্যাপারে অনেক মুসলিম বলে থাকেন ইসলাম শিখিয়েছে সব ধর্মকে সম্মান করতে, কাজেই কোন ধর্মকে ‘বাতিল’ বলা ঠিক নয়, এতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কষ্ট পেতে পারে।

ভাই ও বোনেরা, এ বিষয়টাতে আমাদের খুব ভালোমত জ্ঞান থাকা জরুরি। ইসলাম সব ‘ধর্ম’কে সম্মান দিতে শেখায় না, যেটা শেখায় সেটা হল সব ধর্মের মানুষকে সম্মান দিতে। ধর্মকে সম্মান করা আর ধর্মের মানুষকে সম্মান করা- এ দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইসলাম বলেছে যেকোন অমুসলিম অবশ্যই মানুষ হিসেবে সম্মান ও সদাচরণ পাবার যোগ্য। কিন্তু সেটা এ উপায়ে নয় যে তার ধর্মের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা থাকতে হবে। কেন?

এজন্য যে, ইসলাম বলেছে সে বাদে অন্য সকল ধর্ম, মতবাদ ভ্রান্ত। কাজেই একজন মুসলিম হিসেবে আপনাকে মেনে নিতে হবে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়। যে বস্তু ভ্রান্ত, যেটা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, সেটার প্রতি সম্মান থাকা কী করে সম্ভব?

আগেই বলেছি ইসলামই একমাত্র তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, আর কোনটিই নয়। কাজেই অন্য সকল ধর্ম বা মতবাদে শিরক মিশে আছে। আর শিরক হল সবচেয়ে ভয়াবহ অপরাধ, যা ক্ষমার অযোগ্য। কাজেই শিরককে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঘৃণা করা প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য পালনীয়। সুতরাং যদি আপনি শিরককে ঘৃণা করেন, তবে শিরকের ওপর গড়ে ওঠা কোন ধর্ম বা মতবাদ আপনার সম্মান পেতে পারেনা।

এই কারণেই মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানানো জায়েয নেই। অনেকে এটাকে সাম্প্রদায়িকতা বা কট্টরতা বলে থাকেন। আসলে ব্যাপারটি আমাদের বুঝতে হবে। যদি আপনি খবর পান একটা লোক আরেকটা লোককে কুপিয়ে মেরেছে আপনি কি সেই খুনিকে শুভেচ্ছা জানাতে পারবেন? কখনোই পারবেন না। কারণ খুনকে আপনি অপরাধ মানেন এবং ঘৃণা করেন।

অথচ শিরক হল খুনের চাইতেও বড় অপরাধ, যদিও এর পার্থিব শাস্তি নেই। কাজেই খুনকে যেমন আপনি ঘৃণা করছেন, শিরককেও তেমনি, বা তারচেয়েও বেশি ঘৃণা করতে হবে, এটাই ঈমানের দাবি। আপনি যেমন খুন করলে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন না কারণ আপনি খুনকে ঘৃণা করেন, তেমনি মন্দিরে গিয়ে মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহ্র শিরক করা হচ্ছে, এটাকে কী করে আপনি সম্মান দেখাতে পারেন, ভালোবাসতে পারেন? যদি খুনিকে খুনের জন্য শুভেচ্ছা জানাতে আপনার বাধে, তাহলে কী করে আপনি মূর্তিপূজার উৎসবে খুনের চেয়েও বড় অপরাধ শিরকে নিমজ্জিত লোকেদের 'পূজার শুভেচ্ছা' জানাতে পারেন?

ঠিক তেমনিভাবে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানানোর অর্থ হল ঈসা (আ) কে আল্লাহ্র পুত্র হিসেবে মেনে নেওয়াকে সমর্থন দেওয়া, খৃস্টানদের কার্যকলাপকে সন্তুষ্টির চোখে দেখা। তাদের শিরককে ঘৃনা করতে না পারা।

একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যখন শিরক করে, তাতে যদি আপনার অন্তরে ব্যথা না লাগে, বুঝতে হবে আপনার ঈমানে ঘাটতির কারণে এটা হয়েছে। ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনা, কিন্তু তারা শিরক করে যাচ্ছে, এটাকে পছন্দ করতেও শেখায় না। অন্য ধর্মের উৎসবে আপনার শুভেচ্ছা জানানোর মানে সে যে কাজ করে যাচ্ছে তাতে আপনি সন্তুষ্ট, যা তাকেও নিজের ধর্মের প্রতি আরো আনুগত্যশীল করে তুলবে, অথচ আপনার এটা অত্যন্ত বেদনার বিষয় হওয়ার কথা যে, আরেকজন মানুষ জাহান্নামের পথে পা বাড়াচ্ছে।

কাজেই একজন মুসলিম হিসেবে আপনি একজন হিন্দুকে সম্মান করতে পারেন, কিন্তু হিন্দুধর্মকে না। হিন্দুধর্ম শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এতে সম্মান রাখার কোন অবকাশ নেই। একইভাবে এমনকি একজন নাস্তিকও মানুষ হিসেবে আপনার কাছে সদাচরণ আর ইনসাফ পেতে পারে, কিন্তু তার মানে এই না যে তার নাস্তিক্যবাদকে সম্মান দেখানোর কোন সুযোগ আছে। আশা করি ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি।

তবে উল্লেখ্য, যেসব কাফির নাস্তিক ইসলামকে কটাক্ষ করে, বিদ্বেষ ছড়ায়, ইসলামের শত্রুদের সমর্থন করে, তাদের প্রতি মানুষ হিসেবেও সম্মান রাখা যাবে না। তাদের জন্য শুধুই ঘৃণা থাকতে হবে। এটাও ঈমানের দাবি আর আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ এর নীতি।

সুতরাং 'অসাম্প্রদায়িকতা'র নামে অমুসলিমদের ব্যাপারে এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা যাবেনা যেটা ইসলাম অনুমোদন করেনা।

[৮]

একটা ব্যাপারে কেউ কেউ আপত্তি তুলে থাকেন। একজন লোক তার জীবনে হয়তো কয়েক বছর কুফরি বা শিরক করতে পারে, যেহেতু মানুষের জীবনকাল সীমিত। এর জন্য কেন তার শাস্তি অনন্তকালের জন্য হবে? ৬০ বছরের পাপের শাস্তি কেন অনন্তকালের আগুন?

এ ব্যাপারে যুক্তিটা হল, কোন পাপী ব্যক্তিকে যদি আরো সময় দেওয়া হত, তাহলেও সে পাপই করে যেত। কোন মুশরিককে যদি ১০০০ বছর আয়ু দেওয়া হত, তবু সে শিরকই করে যেত, অনন্তকাল আয়ু দেওয়া হলেও সে এটাই করে যেত। যারা হিদায়াহ পাবার তারা স্বল্পায়ু জীবনেই পেয়ে থাকে, আর যারা পাবার নয় তারা কোনদিনই পাবেনা, যত দীর্ঘায়ুই দেওয়া হোক।

আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন পাপীদের জাহান্নামে প্রেরণের সময় তারা আবার দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে, বলবে আল্লাহ্র ইবাদাত করে ফিরে আসবে। আল্লাহ্ এটাও বলেছেন তারা মিথ্যা বলছে, তাদের আবার দুনিয়ায় পাঠানো হলেও তারা ঐ একই পাপাচার আর কুফরি করেই আসত।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ ভবিষ্যত জানেন। কে জান্নাতি হবে, আর কে জাহান্নামি হবে, এটা আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। যেহেতু আল্লাহ্ জানেন কে পাপ করবে আর কে নেক আমল করবে, তাই তিনি চাইলে মানুষকে দুনিয়ায় না পাঠিয়ে সরাসরি জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু সেটা করলে জান্নাতিরা কোন আপত্তি না তুললেও জাহান্নামিরা বলত-'আল্লাহ, আমাদের তো পাপ করার সুযোগই দিলেন না, আমাদের কেন জাহান্নামে পাঠাচ্ছেন?' তাই আল্লাহ্ তাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যাতে তারা নিজ হাতে জাহান্নামকে কামাই করতে পারে আর শেষ বিচারের দিনে কোন অজুহাত দিতে না পারে।

যে হিদায়াহ পাবার যোগ্য তাকে আল্লাহ্ স্বল্পায়ু জীবনেই তা দেন আর যে পাবার যোগ্য না সে লক্ষ বছর আয়ু পেলেও পাবেনা, এটা আল্লাহ্ জানেন। সীমিত জীবনের পাপের শাস্তি অসীম হবার কারণ এটাই। আল্লাহ্ অল্প সময়ে সংক্ষিপ্ত জীবনেই তাঁর পরীক্ষাগুলো নিয়ে নেন।

[৯]

একটা প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। যদি এমন কোন লোক থেকে থাকে যে বাস করেছে লোকালয় থেকে অনেক দূরে; যেমন আমাজান বনের গহীনে কোন গোষ্ঠী থাকে, যাদের কাছে সত্য দ্বীনের আলো কখনো পৌঁছেনি, তাহলে তাদের ব্যাপারে কী ফায়সালা? আবার হতে পারে শারীরিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে কারো পক্ষে ধর্মের কথা অনুধাবন করা সম্ভব হল না। সেক্ষেত্রে তার বিচার কী? অথচ আল্লাহ্ বলেছেনঃ

"রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি লোকেদের শাস্তি দিই না।" [আল ইসরা-১৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসির ইবনে কাসীরে একটি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে রাসূল (সা) এ জাতীয় মানুষের বিচারের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। সেটা এভাবে হবে যে, বিচার দিবসে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে সুস্থ মস্তিষ্ক এবং শারীরিক সক্ষমতাসহ। তারপর আল্লাহ্ তাদের থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার নেবেন এবং তাদের সম্মুখে একটি আগুনের দেওয়াল তৈরি করবেন। একজন ফেরেশতা তাদের কাছে তাওহীদের বাণী বুঝিয়ে বলবে। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা আদিষ্ট হবে ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে। আগুনে পূর্ণ দেওয়ালের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে তারা ইতস্তত করবে।

যারা তাওহীদকে অন্তরে ধারণ করবে তারা আল্লাহর আদেশকে আগুনের ভীতির ওপর স্থান দেবে এবং আগুনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তারা দরজার ওপারে গিয়ে দেখবে সুসজ্জিত জান্নাত। আর যারা আগুনের ভয়ে আল্লাহর আদেশ মানবে না তারা আল্লাহ্কে একমাত্র ইলাহ মানতে পারেনি, কারণ তারা অগ্নিভীতিকে আল্লাহর আদেশের ওপর স্থান দিয়েছে। কাজেই তারা তাওহীদ মেনে চলতে না পারায় জাহান্নামী হবে। বস্তুত দুনিয়ায় যদি তাদের কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছে যেত তবু তারা তা লঙ্ঘন করত। আর যারা দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে তারা দুনিয়াতেও আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলত। এভাবে আল্লাহ্ সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের বিচার করে নেবেন।

* * *

শেষ কথাঃ আপাতত এ কয়েকটি বিষয়ে আমার সাধ্যানুসারে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে আরো কিছু বিষয় নিয়ে লেখার ইচ্ছা আছে। আমার লেখা যদি একজন মুসলিমেরও কনফিউশন দূর করতে অবদান রাখে তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। লেখাটার যা কিছু ভালো তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর যা কিছু ভুলত্রুটি তা আমার পক্ষ থেকে।

আল্লাহ্ আমাদের অন্তরকে শিরকমুক্ত রাখুন এবং সহীহ আক্বীদার ওপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

* * *

[বি.দ্র. আমার এই লেখাটি কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি। লেখা হয়েছে সেইসকল মুসলিমদের উদ্দেশ্যে, যারা এ ব্যাপারগুলো নিয়ে সংশয়ে আছেন। যেহেতু আমি এখানে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছি তাই যুক্তিগুলো অন্য ধর্মের অনুসারীদের মনঃপুত হবেনা এটাই স্বাভাবিক। এজন্য তাদের এ লেখাটি পড়তে আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। বরং এতে কমেন্টবক্সে বিতর্কসৃষ্টি হতে পারে যা আমি প্রত্যাশা করছি না। যারা লেখাটা পড়ছেন তাদের ব্যাপারটি লক্ষ্য রাখার অনুরোধ রইল।]